ইউনিট ৩ ধর্ম দর্শন

ভূমিকা

ধর্ম সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনা তাকে বলা হয় ধর্মদর্শন। ধর্মের দুটি দিক আছে। একটি তাত্ত্বিক, অপরটি ব্যবহারিক। 'তত্ত্ব' কথাটির অর্থ হচ্ছে নির্ধারিত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান। ধর্মের উৎপত্তি, ধর্মের স্বরূপ, ধর্মের উপকারিতা, ধর্মে ঈশ্বরের স্থান, অবতার- চেতনা প্রভৃতি ধর্মতত্ত্বে স্থান লাভ করে। এ সঙ্গে ধর্মের ব্যবহারিক দিকটিও বিবেচনায় আনতে হয়। ঈশ্বর উপাসনা, জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি– এ সব সাধন-পদ্ধতিও ধর্মদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এ ইউনিটে ধর্মদর্শনের উল্লিখিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে মোট পাঁচটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ- ৩.১: ধর্মতত্ত্ব

পাঠ- ৩.২: ঈশ্বরতত্ত্ব

পাঠ- ৩.৩: অবতার

পাঠ- ৩.৪: উপাসনা পদ্ধতি: কর্ম ও জ্ঞান

পাঠ- ৩.৫: উপাসনা পদ্ধতি: ভক্তি ও যোগসাধনা

পাঠ ৩.১

ধর্মতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ধর্ম কি তা বলতে পারবেন।
- ধর্মের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ধর্ম অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আপদ্ধর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।

ধর্ম ও তার লক্ষণ

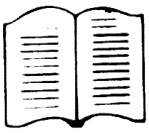

সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতুর সহিত 'মন্' প্রত্যয় যোগে (ধৃ + মন্) ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি। যা কিছু ধারণ-শক্তি সম্পন্ন তাই ধর্ম। প্রত্যেক বস্তুরই নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। যেমন উত্তাপ ও আলো অগ্নির ধর্ম। এই উত্তাপ ও আলো নষ্ট হলে অগ্নির অস্তিত্ব থাকে না। মানুষেরও একটি ধর্ম আছে, সেটি হলো মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব থাকলেই মানুষ যথার্থ মানুষ, তা না থাকলে তাকে যথার্থ মানুষ বলা যাবে না। সে হবে মনুষ্য আকৃতির একপ্রকার প্রাণী। এখন মানুষের ধর্ম বা মনুষ্যত্ব বলতে শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে সেটি দেখা যাক। মনুসংহিতায় ধর্মের ছোট্ট একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে–

"অহিংসাসত্যমস্তেয়ং শৌচং সংযমমেব চ।
এতৎ সামাসিকং প্রোক্তং ধর্মস্য পঞ্চলক্ষণম্॥"

অর্থাৎ হিংসা না করা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শৌচ (পবিত্র) থাকা এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া।

—এই পাঁচটিকে মনুষ্যত্বের তথা ধর্মের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ গুণগুলো অনুশীলন করে মানুষ তার ভেতরকার পশুভাবকে দমন করে মানুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে পারে।

ধর্মের বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে–

'যতোবাহভ্যুদয়–নিশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।'

—যা থেকে জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণ হয় তাকে ধর্ম বলে। তাহলে কথাটি দাঁড়ায়, ধর্ম হচ্ছে সে সব কর্ম যা অনুশীলন করে সাংসারিক উন্নতির জন্য ধনমান যশ ইত্যাদি লাভ করতে পারে, আবার জীবনের পরম-প্রাপ্তি-রূপে মোক্ষ লাভও করতে পারে।

প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে। ধর্ম নষ্ট হলে ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তিরও পতন ঘটে থাকে। এ সম্পর্কে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে–

"ধর্ম এব হতো হন্তি, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মো ন হন্তব্যো, মা নো ধর্মো হতোহবধীৎ॥"

–ধর্ম নষ্ট হলে নাশ করে, রক্ষিত হলে রক্ষা করে; সুতরাং কখনো ধর্ম নষ্ট করতে নেই। ধর্ম যেন নষ্ট হয়ে আমাদের বিনাশ না করে। মনে রাখা দরকার, বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠান এই তিনে মিলেই ধর্মের প্রাণ। এর কোন একটি বাদ দিলে ধর্ম রক্ষা পাবে না।

সুতরাং ধর্মতত্ত্বের সার কথা হল ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে পবিত্র ভাবে ভক্তিভরে ধর্মানুষ্ঠান করা। ধর্ম মানুষকে জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় কল্যাণ দান করে। তবে যুগে যুগে ধর্ম–কর্মের আদর্শ কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক যুগে বিশিষ্ট ধর্মবেত্তা স্বামী বিবেকানন্দ জীবের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন এবং জীবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর সেবার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আপদ্ধর্ম

ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে মহাভারতে আপদ্ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে। মানুষের জীবন নানারকম আপদ-বিপদের মধ্য দিয়ে কাটে। আপৎকালে ধর্মের বিধিবিধান পালন করা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে সত্য রক্ষা করতে গিয়ে এক মুনি কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ছিলেন, সে কাহিনী শোনা যাক।

বনপথে এক পথিক যাচ্ছে; সেখানে ডাকাতের ভয়। হঠাৎ কয়েকজন ডাকাত পথিককে তাড়া করল। সে প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে এক মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে লুকিয়ে রইল। ঘটনাটি মুনি দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ পর ডাকাতের দল সেখানে এসে মুনিকে জিজ্ঞেস করল সেখানে পথিক এসেছে কিনা? মুনি ভাবনায় পড়লেন। সত্য কথা বললে পথিক ডাকাতের হাতে মারা পড়ে। আর যদি মিথ্যা বলেন তাহলে মুনিকে পাপাভাগী হতে হবে। এরূপ অবস্থায় মুনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। ডাকাতদল পথিককে খুঁজে বের করল এবং তাকে হত্যা করে তার ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে গেল। পরিণামে মুনির ভাগ্যে দুর্ভোগ নেমে এল। নরহতার অপরাধে মুনিকে নরক ভোগ করতে হল।

এ ঘটনায় মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সত্য বলা ধর্ম হলেও একজনের জীবন রক্ষার্থে সত্য পরিত্যাগ করা যায়। তিনি যদি মিথ্যে করে বলতেন, পথিক সেখানে নেই, তাহলে ডাকাতের দল চলে যেত তাঁকে বিশ্বাস করে। পথিক প্রাণে বেঁচে যেত। তাহলে দেখা যাচ্ছে আপদকালীন অবস্থায় সত্য না বলে মিথ্যা বলাই ছিল ধর্ম।

সারাংশ

যা ধারণ-শক্তিযুক্ত তাকেই ধর্ম বলা হয়। সকল বস্তুরই নিজ নিজ ধর্ম আছে। মানুষেরও ধর্ম রয়েছে- সেটির নাম মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ কতকগুলো গুণাবলীর মধ্যে। যেমন অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, সংযম, পবিত্রতা, পর দ্রব্য অপহরণ না করা ইত্যাদি। ধর্ম মানুষের জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণ সাধন করে। ধর্ম মেনে চললে ধার্মিককে ধর্ম রক্ষা করে। ধর্মচর্চার প্রধান লক্ষ হচ্ছে ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভ করা। ঈশ্বরসেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবার কথা বলেছেন। তবে ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধি সজাগ থাকতে হবে। আপৎকালে অপরের প্রাণ রক্ষার্থে মিথ্যা বলাও অধর্ম হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ধর্ম সম্বন্ধে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনা তাকে কি বলা হয়?
ক. ধর্মদর্শন খ. ধর্মতত্ত্ব
গ. ধর্মব্যাখ্যা ঘ. ধর্মপ্রচার।

২। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি কোন্‌টি?
ক. ধৃ + মনন্‌ খ. ধৈ + মন
গ. ধৃ + মন্‌ ঘ. ধী + মন।

৩। মানুষের ধর্মকে এক কথায় কি বলা হয়?
ক. দেবত্ব খ. মনুষ্যত্ব
গ. দেবত্ব ঘ. জীবসেবা।

৪। ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থে আপদ্ধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক. রামায়ণে খ. ভাগবতে
গ. বিষ্ণুপুরাণে ঘ. মহাভারতে।

৫। কি অনুশীলন করলে মানুষ জাগতিক ও পারমার্থিক কল্যাণ লাভ করতে পারে?
ক. ধর্ম খ. বিজ্ঞান
গ. সাহিত্য ঘ. সংস্কৃতি।

৬। অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, সংযম, চুরি না করা, শুচিতা– এগুলো কিসের লক্ষণ?
ক. ধর্মতত্ত্বের খ. ধর্মদর্শনের
গ. ধর্মের ঘ. দেবত্বের।

পাঠ ৩.২ ঈশ্বরতত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- জীবের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর সাকার না নিরাকার তা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর কোথায় থাকেন তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

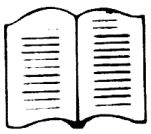

ঈশ্বর শব্দটি একটি সংস্কৃত শব্দ। ঈশ্ ধাতুর সঙ্গে বরচ্ প্রত্যয় যোগ করে **ঈশ্বর** শব্দ গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হল শক্তিমান। তবে সাধারণ শক্তিমান নন, সর্বশক্তিমান। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা ও সংহারকর্তা। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব ও অনন্ত তাঁর রূপ। জ্ঞানীর কাছে তিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা, আবার ভক্তের কাছে তিনি ভগবান।

ব্রহ্মের স্বরূপ

ব্রহ্ম মানে সর্ববৃহৎ। যিনি সকল জীব ও বস্তুকে বড় করেন তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ। তিনি জ্যোতির্ময়, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান।

ব্রহ্মের এই পরিচয় থেকে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি যদি সর্বব্যাপী হন; তবে তিনি তো সকলের মধ্যে রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাকে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্নের অনুসন্ধান করতেই মানুষ নিজের মধ্যে আত্মার সন্ধান লাভ করে। ব্রহ্মাই জীবের মধ্যে আত্মা রূপে অবস্থান করছেন।

আত্মা

জীবের মাঝে যে চৈতন্য রয়েছে সেটি আত্মা। আত্মাও ব্রহ্মের ন্যায় জন্ম–মৃত্যুহীন। কেউ তার বিনাশ করতে পারে না। এমনকি আত্মাকে কেউ শেষ করতে পারে না। আত্মা নিরাকার হয়েও জীবদেহে চেতনারূপে অবস্থান করেন। তবে জীবের দেহ নষ্ট হলেও আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। মৃত্যু মানে আত্মার দেহত্যাগ।

ঈশ্বর

ব্রহ্মা এবং আত্মা উভয়ই নিরাকার। তবে নিরাকার হয়েও ব্রহ্মের ভিতরে জীব ও জগতের সৃজন, প্রতিপালন ও সংহারের সমস্ত শক্তি রয়েছে। এই শক্তিমান অবস্থায় ব্রহ্মকে বলা হয় ঈশ্বর।

ঈশ্বরের স্বরূপ

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি কখনো নিরাকারে বা সাকারে অবস্থান করেন। এই ঈশ্বরকে যখন ষড়্ ঐশ্বর্যমন্ডিত (ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য) কল্পনা করা হয় তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান।

ভগবানের স্বরূপ

ভক্তের নিকট ঈশ্বর ভগবান। ভগবান গুণময়। অনন্ত তাঁর গুণ। অশেষ তাঁর রূপ। তিনি রসময় ও আনন্দময়। ভগবানের মধ্যে ভক্ত তাঁর ইচ্ছামত রূপ ও ভাব দেখতে পান। ভগবানের সঙ্গে ভক্ত

গভীর সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই ভক্ত তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ভগবানকে মাতা, পিতা, বন্ধু, প্রিয়জন হিসাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; দুঃখ দুদর্শা থেকে উদ্ধারের প্রার্থনা জানান।

ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

ঈশ্বর পরম পবিত্র; অশেষ গুণের অধিকারী তিনি। তিনি পাপতাপ–যুক্ত জগতে থাকতে পারেন না। তাই অনেকের ধারণা, ঈশ্বর থাকেন স্বর্গলোকে, পাপতাপ–যুক্ত জগত থেকে অনেক দূরে। বাক্য-মন ও চিন্তার জগতের অতীতে তিনি অবস্থান করেন।

তবে এ মত সবাই স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন ঈশ্বর রয়েছেন জগতের মধ্যে। তিনি বিরাজ করছেন সর্বত্র। তাইতো সব কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে কবি বলেছেন—

"আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে
ভূধরসলিলগহনে।
আছ বিটপিলতায় জলদের গায়
শশিতারকায়, তপনে॥"

আবার ঈশ্বর মানুষের মন, বুদ্ধি ও হৃদয়েও আছেন। তিনি আমাদের মাঝে থেকে, আমাদের চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁকে পাবার জন্য দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। তিনি রয়েছেন সকলের অন্তরে। এই অন্তর্যামী ঈশ্বরের কাছে কবিগুরু প্রার্থনা নিবেদন করে বলেছেন—

"অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।"

ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি নিরাকারও থাকতে পারেন আবার সাকার রূপেও বিরাজ করতে পারেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বর বা ভগবান সাকার। আবার জ্ঞানীর কাছে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম।

ঈশ্বর – উপাসনা

ঈশ্বরকে সাকারে ও নিরাকারে- উভয়ভাবেই ভজনা করা যায়। কেউ যদি ঈশ্বরকে সাকারে আরাধনা করে ঈশ্বর তাকে সাকারে অনুগ্রহ করে থাকেন। আবার কেউ যদি ঈশ্বরকে নিরাকার ব্রহ্মরূপে ধ্যান করেন, তার অন্তরে ঈশ্বর ব্রহ্মভাবই জাগিয়ে দেন। ঈশ্বর পরম করুনাময়। যিনি যেভাবে ঈশ্বরকে আরাধনা করেন, ঈশ্বর তাকে সেভাবে অনুগ্রহ করেন।

সারাংশ

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি একাধারে সৃষ্টিকর্তা, পালন কর্তা ও সংহারকর্তা। ঈশ্বর যখন নিরাকারে অবস্থান করেন তখন তিনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করছেন। যখন ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করা হয়, তখন তাঁকে বলা হয় ভগবান। ঈশ্বর জগতের সর্বত্র বিরাজমান। জীবের মাঝে আত্মারূপে,চেতনা রূপে তিনি অবস্থান করছেন। সাকার নিরাকার উভয়ভাবেই ঈশ্বরকে আরাধনা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঈশ্বর কিরূপ শক্তিমান?
ক. সাধারণ শক্তিমান
খ. বিশেষ শক্তিমান
গ. সর্বশক্তিমান
ঘ. প্রচন্ড শক্তিমান।

২। ঈশ্বর জীবের মাঝে কি রূপে অবস্থান করছেন?
ক. মনরূপে
খ. বুদ্ধিরূপে
গ. বিবেকরুপে
ঘ. আত্মারূপে।

৩। ঈশ্বর কিরূপ?
ক. নিরাকার
খ. সাকার
গ. সাকার ও নিরাকার উভয়ই
ঘ. এর কোনটিই নয়।

৪। ঈশ্বর কোথায় থাকেন?
ক. সর্বত্র
খ. স্বর্গ
গ. ভক্ত হৃদয়ে
ঘ. বৈকুন্ঠে।

পাঠ ৩.৩ অবতার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অবতার কি তা বলতে পারবেন।
- অবতারের প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।
- অবতারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অবতার-মাহাত্ম্য বলতে পারবেন।

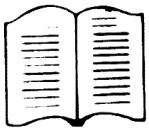

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি জন্ম–রহিত হয়েও মাঝে মাঝে জীবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন। ঈশ্বরের জীবদেহ ধারণ করে জগতে আসার নাম **অবতার**।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম– এ পাঁচটিকে বলে পঞ্চভূত। আর এই পঞ্চভূতে গড়া প্রাকৃত জগতকে বলে প্রপঞ্চ। পঞ্চভূতের অতীত অপ্রাকৃত পরব্যোমকে বলে অপ্রপঞ্চ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে "অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণম্ অবতারঃ" অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ থেকে প্রপঞ্চে নেমে আসেন বলে ঈশ্বর অবতার। আর নেমে আসার অপরনাম অবতরণ। যিনি (ঈশ্বর) অবতরণ করেন তিনিই অবতার। অবতার জীবদেহধারী ঈশ্বর।

অবতারের প্রণালী

ঈশ্বর কিভাবে দেহধারণ করে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন-

> "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

অর্থাৎ আমি জন্মহীন অব্যয়াত্মা জীবগণের প্রভু হয়েও নিজ মায়া অবলম্বনে দেহ ধারণ করে থাকি।

এখানে **মায়া** শব্দটি বলতে ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে বোঝানো হয়েছে। জগত সৃষ্টির মূলে এই মায়ার প্রভাব রয়েছে। তবে ঈশ্বর ও জীবের উপর মায়ার প্রভাবের পার্থক্য লক্ষণীয়। জীব মায়ার অধীন। জীবকে মায়া মোহিত করে রাখে। কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় মায়ার অধীন নন। মায়াই ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন। এই মায়াশক্তিকে অবলম্বন করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

ঈশ্বর ও অবতারের মধ্যে পার্থক্য

১. ঈশ্বরের জন্ম-মৃত্যু নেই। অসীম অনন্ত তিনি। অবতারের জন্ম-মৃত্যু আছে। তিনি সসীম এবং ঈশ্বরের অংশবিশেষ।
২. ঈশ্বরের কোন কর্ম নেই। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করেন না। কিন্তু অবতার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। উদ্দেশ্য শেষ হলে তিনি দেহত্যাগ করেন।

অবতারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

ঈশ্বর যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে তাঁর ইচ্ছানুসারে অবতার রূপে আসতে পারেন। তবে শাস্ত্রে দেখা যায়, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে গীতায় ভগবান বলেছেন– যখন ধর্মে গ্লানি, অধর্মের বৃদ্ধি ঘটে তখন সমাজে দুষ্টজনের বিনাশ ও সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে থাকি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বর অবতাররূপে দেহধারণ করে এসে তিনটি কাজ করে থাকেন–

ক. দুষ্টে বিনাশ করেন।
খ. সাধুদের রক্ষা করেন এবং
গ. সমাজে ধর্ম সংস্থাপন করেন।

অবতার-মাহাত্ম্য

অবতারের মধ্যে জ্ঞানী বা ভক্ত ঈশ্বরকে নিকটে পান। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তি প্রত্যক্ষ করে তাঁদের অন্তরের ভগবদ্ভক্তিকে সুদৃঢ় করেন। অবতার স্বয়ং ঈশ্বরেরই প্রকাশ বলে তিনি মুক্ত, তাঁর কোন বন্ধন নেই। অবতার শুধু নিজেই মুক্ত স্বভাবের নন, তিনি অপরকেও মুক্তিদান করতে পারেন। তিনি ভক্তের মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ। অবতার পুরুষের সংস্পর্শে জীব মুক্তি লাভ করতে পারে। অবতার নিজের স্পর্শ দিয়ে এমনকি কেবল ইচ্ছাশক্তি দিয়েই অপরের ভিতর ভগবদ্ভাব সঞ্চার করে দিতে পারেন। অবতারের সংস্পর্শে অতি দুরাচার ব্যক্তি মুহূর্তের মধ্যে সাধু হয়ে যেতে পারে।

সারাংশ

দেহ ধারণ করে ঈশ্বর অবতাররূপে এসে থাকেন। মায়া শক্তিকে অবলম্বন করে ঈশ্বর অবতীর্ণ হন। অবতার দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম সংস্থাপন করে থাকেন। অবতার জীবদেহধারী ঈশ্বর। তাঁর সান্নিধ্যে মানুষ মহৎ গুণের অধিকারী এবং মুক্তিলাভে সমর্থ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ঈশ্বর অপ্রপঞ্চ থেকে প্রপঞ্চে নেমে আসেন বলে তাঁকে কি বলা হয়?
ক. অবতার
খ. বিষ্ণু
গ. অবতরণ
ঘ. সৃষ্টিকর্তা।

২. ঈশ্বর অবতার রূপে আসার জন্য কোন শক্তিকে অবলম্বন করেন?
ক. সৃজনশক্তি
খ. পালনশক্তি
গ. সংহারশক্তি
ঘ. মায়াশক্তি।

৩. দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম সংস্থাপন-এগুলো কার কাজ?
ক. নেতার
খ. শাসকের
গ. ঈশ্বরের
ঘ. অবতারের।

৪. কার সংস্পর্শে অতি দুরাচার ব্যক্তিও সাধু হয়ে যেতে পারে?
ক. সদ্ব্যক্তির
খ. অবতারের
গ. ভক্তের
ঘ. জ্ঞানীর।

প্রয়োজনীয় বিষয়ে নোট করুন

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

পাঠ ৩.৪

উপাসনা পদ্ধতি: কর্ম ও জ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কর্ম কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মযোগের লক্ষণগুলো বলতে পারবেন।
- কর্মযোগে কি ফল লাভ হয় তা লিখতে পারবেন।
- জ্ঞানযোগ কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জ্ঞানযোগের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জ্ঞানের ফল কি কি তা বলতে পারবেন।

কর্মযোগ

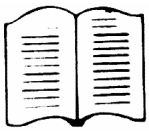

যা কিছু করা হয় সেটিই কর্ম। কর্ম দুপ্রকার- **সকাম কর্ম** ও **নিষ্কাম কর্ম**। ফললাভের আশায় যে কর্ম করা হয় তাকে বলা হয় সকাম কর্ম। আবার যে কর্মে ফলের আশা থাকে না তা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মই কর্মযোগ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কর্মযোগের ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে মনকে যুক্ত রেখে, কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করে, কর্ম করাকে কর্মযোগ বলে। কর্মকর্তা যখন মনে করেন, সমস্ত কর্মই ঈশ্বরের কর্ম, কর্মের ফলও ঈশ্বরেরই প্রাপ্য; ঈশ্বর তাকে দিয়ে কর্ম করিয়ে নিচ্ছেন মাত্র, তখন এরূপ অনুভূতি থেকে নিস্পন্ন কমর্কে কর্মযোগ বলা হয়।

কর্মযোগের লক্ষণ তিনটি।

(১) ফলাকাঙ্খা বর্জন।
(২) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ (আমি কর্ম করছি এই অনুভূতি না থাকা)
(৩) কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ।

বিশ্বজগত বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে সকলকেই কিছু কর্ম করতে হয়। আবার কর্ম করলেই কর্মফলের উদ্ভব ঘটে। আর সে কর্মফল কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এরূপ কর্মে হয় বন্ধন; মানুষ মুক্তিলাভ করতে পারে না। কিন্তু কর্মকে যখন ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তখন সেটি হয় কর্মযোগ। তখন কর্তা কর্মের সমস্ত ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে থাকেন বলে এরূপ কর্মে বন্ধন হয় না। মোট কথা কর্মে বন্ধন হয় না, বন্ধন হয় কর্মফলের বাসনায়।

কর্মযোগে কয়েকটি ক্রম লক্ষ্য করা যায় যেমন–

(ক) কর্ম করার অহংকার লোপ পায়; তখন কর্তার মনের সাত্ত্বিক বুদ্ধির উদয় হয়।
(খ) কর্তার সর্বত্র সমদর্শন হয় এবং তিনি নির্মল আনন্দ লাভ করেন।
(গ) ভগবানের প্রতি কর্তার অচলা ভক্তিজন্মে। এবং তিনি ঈশ্বর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন।

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানের মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। সাধারণভাবে জ্ঞান বলতে চেতনা, বিবেচনা ও বোধকে বুঝিয়ে থাকে। তবে সব রকম জ্ঞানকে জ্ঞানযোগ বলে না। জ্ঞানকে যখন ঈশ্বর লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন সেটি হয় জ্ঞানযোগ। জ্ঞানী উপলব্ধি করেন, তাঁর নিজের মধ্যে এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর মধ্যে একই আত্মা বিরাজমান। জগতের সব কিছু পরম পুরুষে অর্থাৎ পরমাত্মার সত্ত্বায় সত্ত্বাবান। তবে জীবদেহের আশ্রয়ে পরমাত্মার নাম হয় জীবাত্মা।

এই জীবাত্মা এবং পরমাত্মা মূলত একই বস্তু। মায়ার প্রভাবে মানুষ এ কথা ভুলে যায়। মায়া কেটে গেলে মানুষ আত্মতত্ত্ব বুঝতে পারে। তখন আত্মতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব এক হয়ে যায়। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।

জ্ঞানযোগে সাধক সাম্য দৃষ্টি লাভ করে। সাধকের মনে সমবুদ্ধির উদয় ঘটে। বাসনা হয় শুদ্ধ। আচরণ হয় সুন্দর। তার অহংকার থাকে না, হিংসা থাকে না। সরলতা, পবিত্রভাবে থাকা, গুরুসেবা, জ্ঞানের বিষয় আলোচনা, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ তাঁর মধ্যে প্রকাশ পায়।

জ্ঞান লাভের উপায়

জ্ঞান লাভের ছয়টি উপায় আছে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, ও সেবা– এই তিনটিকে বলে জ্ঞান লাভের বহিরঙ্গ উপায়। আবার শ্রদ্ধা, তৎপরতা ও ইন্দ্রিয় সংযম- এ তিনটিকে বলে জ্ঞান লাভের অন্তরঙ্গ উপায়।

ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়, প্রণাম হচ্ছে প্রণিপাত। এরপর তত্ত্বকথা জানার জন্য বিনীত ভাবে প্রশ্ন করতে হয়; এভাবে প্রশ্ন করাকে বলে পরিপ্রশ্ন।

সেবা বলতে বুঝায় গুরুর সুখবিধান। সেবায় তুষ্ট হয়ে গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দান করেন।

বহিরঙ্গের ন্যায় অন্তরঙ্গের সাধনগুলোও জ্ঞান লাভের সহায়ক।

শ্রদ্ধা

শাস্ত্রে ও শুরুবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা হয়।

তৎপরতা

গুরুর উপদেশ লাভ করে তা আত্মস্থ করার জন্য তৎপর হতে হয়। মনোযোগী হতে হয়। পরম তত্ত্বে মনকে গভীরভাবে নিবিষ্ট রাখাই তৎপরতা।

ইন্দ্রিয় সংযম

সকল সাধন কর্মের মূলেই রয়েছে ইন্দ্রিয়সংযম। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়; তারপর ওই নিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়গুলোকে দিয়ে পরম তত্ত্বের অনুকূলে কাজ করিয়ে নিতে হয়। যেমন মুখে হরিগুণ গান; হাতে শ্রীহরির চরণসেবা ইত্যাদি।

জ্ঞানযোগের ফল হচ্ছে—

(ক) শোক, মোহ ইত্যাদি দূর হয়।
(খ) সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।
(গ) অজ্ঞানতা থাকে না।
(ঘ) জ্ঞানীর কর্মবন্ধন নেই। জ্ঞানেই মোক্ষলাভ।

সারাংশ

কর্ম দুপ্রকার- সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্মে জীবের বন্ধন আর নিষ্কাম কর্মে জীবের মুক্তি। নিষ্কাম কর্মকেই কর্মযোগ বলা হয়। শাস্ত্রমতে আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্ব জানাকে জ্ঞান বলে। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আত্মা বিরাজ করছে। এই আত্মা পরমাত্মার অংশ বিশেষ। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই- এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান লাভের জন্য শ্রদ্ধাবান, সংযমী এবং তৎপর হওয়া দরকার। জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন"

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফল লাভের আশায় যে কর্ম করা হয় তাকে কি বলা হয়?
ক. নিষ্কাম কর্ম
খ. সকাম কর্ম
গ. কার্মকর্ম
ঘ. মুখ্যকর্ম।

২। কোন্ যোগে কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করা হয়?
ক. কর্মযোগ
খ. জ্ঞানযোগে
গ. বুদ্ধিযোগে
ঘ. সংযমযোগে।

৩। জীবদেহে যে আত্মা থাকে কি বলা হয়?
ক. পরমাত্মা
খ. মানবাত্মা
গ. জীবাত্মা
ঘ. প্রেতাত্মা।

৪। জ্ঞান লাভের আকাঙ্খায় গুরুকে শ্রদ্ধানিবেদন করাকে কি বলা হয়?
ক. প্রণাম
খ. নমস্কার
গ. শ্রদ্ধাপ্রণতি
ঘ. প্রণিপাত।

পাঠ ৩.৫

উপাসনা পদ্ধতি: ভক্তি ও যোগসাধনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভক্তিযোগ কি তা বলতে পারবেন।
- ভক্তিযোগের ফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- যোগ সাধনা কি তা বলতে পারবেন।
- অষ্টাঙ্গযোগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভক্তি

গুরুজন বা ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বা ভালবাসাকে ভক্তি বলে। আর ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা করা তার নাম ভক্তিযোগ। কর্মও জ্ঞান-যোগের ন্যায় ভক্তিযোগও ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি। ভক্তিযোগে ঈশ্বর লাভ হয়।

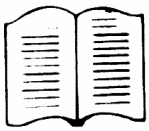

ভক্তি পরম সম্পদ। ভক্তি লাভে হৃদয় পবিত্র হয়। আর ঐ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের অনুভূতি সুদৃঢ় হয়। ভক্তি লাভ করে, ভক্ত জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্যে ভগবানের অস্তিস্ত অনুভব করেন। ভক্ত মুখে ভগবানের গুণকীর্তন করেন এবং মনকে ভগবানের চিন্তায় নিবিষ্ট রাখেন। ভক্ত কামনা বাসনা মুক্ত হন। যদি কখনও কোনো বাসনা অন্তরে জাগে তা, ভগবানে সমর্পণ করেন। ভগবান ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা ভক্তের মনে স্থান পায় না। ভক্ত হোম, জপ, তপ, ব্রত, নিয়ম– এ সমস্তই ভগবানের প্রীতির জন্য করে থাকেন। মোট কথা, জীবনে ধর্ম, অর্থ, কাম ইত্যাদি একমাত্র ভগবানের প্রীতির জন্যই সম্পাদন করেন। এভাবে জীবনের সমস্ত কর্ম ভগবানে নিবেদনের মধ্যদিয়ে ভক্ত ভক্তি লাভ করে থাকেন।

ভক্তির শ্রেণীভেদ

প্রধানত ভক্তিকে দুভাগ করা হয়– **অহৈতুকী ভক্তি**, **হৈতুকীভক্তি**।

যে ভক্তিতে ভগবানের প্রীতি ভিন্ন অন্যকোন হেতু নেই; অর্থাৎ যে ভক্তিতে কোনো প্রার্থনা পূরণের কামনা নেই তাকে **অহৈতুকী ভক্তি** বলে।

কোনো হেতু অবলম্বন করে যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে **হৈতুকী ভক্তি** বলে। ঈশ্বর আমাকে কত সম্পদ দিয়েছেন কি দেবেন, কত রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন কি করবেন– এরূপ চিন্তা করতে করতে যে ভক্তির উদয় হয় তাকে হৈতুকী ভক্তি বলে।

ভক্তিযোগের সাধক অহৈতুকী ভক্তিরই অনুসরণ করে থাকেন। ভক্ত নিজের জন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। এমন কি নিজের মুক্তিটি পর্যন্ত ভগবানের নিকট কামনা করেন না। তার কামনা হয়, হে প্রভু, জনমে-জনমে যেন তোমার চরণে আমায় অহৈতুকী ভক্তি জন্মে।

ভক্তিযোগ সাধনার শেষস্তর; ভক্তিতে মুক্তি।

যোগসাধনা

যোগ অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরাধনা তাকে **যোগসাধনা** বলা হয়। যোগাসন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দেহ ও মনকে ঈশ্বর আরাধনার উপযোগী করতে হয়। পদ্মাসন, সহজাসন, গোমুখাসন, প্রভৃতি অনুশীলন করে দেহ ও মনকে যোগ সাধনার উপযোগী করে নিতে হয়।

যোগসাধনায় যোগী অষ্টাঙ্গযোগ অনুসরণ করে থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগ হল যম, নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি। সাধনার ক্ষেত্রে যোগের নিয়মগুলো ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়। হিংসা, লোভ, আবেগ ইত্যাদি ত্যাগ করে মনকে শান্ত রাখার সংযম।

যম

যম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম।

নিয়ম

সংযমের দ্বারা শান্ত মনকে নিয়মিত শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত করাকে বলে নিয়ম।

আসন

যোগী বা সাধক ঈশ্বর চিন্তায় কিভাবে বসবেন তারই নির্দশ রয়েছে আসনের মধ্যে। সুখাসনে বা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়ে যোগী ঈশ্বর সাধনায় বসবেন।

প্রত্যাহার

মন স্বভাবিকভাবেই চঞ্চল। বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকে মনকে গুটিয়ে এনে এক ঈশ্বর চিন্তায় নিবিষ্ট করার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাহার বলা হয়।

প্রাণায়াম

শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে প্রাণায়াম বলে।

ধ্যান

উল্লিখিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সুস্থিরচিত্তে ঈশ্বরের অবস্থান বা উপস্থিতি অনুভব করার নামই ধ্যান। ধ্যেয় বস্তুর প্রতি নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার নাম ধ্যান।

ধারণা

ধ্যানে লব্ধ উপাস্য সম্পর্কে চিন্তা করাকে ধারণা বলে। মনকে একটি লক্ষের বা বিন্দুর প্রতি সংস্থিত করার পদ্ধতিকে ধারণা বলা হয়।

সমাধি

যোগী ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়ে উপাস্যে মন নিবিষ্ট রাখতে রাখতে যখন উপাস্যের সঙ্গে একত্ব অনুভব করেন, তখন সে অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। সাধনার ক্ষেত্রে সমাধি হচ্ছে উচ্চতম সোপান।

গীতায় যোগসাধনার অনেক প্রশংসা রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা যোগেশ্বর। যোগসাধনার মধ্য দিয়ে সাধক নিজ আত্মায় পরমাত্মার সঙ্গ লাভ করে পরমানন্দে অবস্থান করেন। যোগীপুরুষ যোগাবলম্বন করে দেহত্যাগ করে মোক্ষ লাভ করেন।

সারাংশ

গুরুজনে বা ঈশ্বর গভীর শ্রদ্ধাকে ভক্তি বলে। ভক্তি অবলম্বন করে ঈশ্বর আরাধনার নাম ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয়। অহৈতুকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি। যোগসাধনা ঈশ্বরকে লাভ করার একটি উপায়। যোগাসন অনুশীলনে দেহ ও মনকে ঈশ্বর আরাধনার উপযোগী করতে হয়। এরপর অঙ্গাঙ্গ যোগ অনুশীলন করে যোগী পরমপুরুষে মিলিত হন। যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করে যোগী মোক্ষ লাভ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভক্তিকে অবলম্বন করে যে ঈশ্বর আরধনা তাকে কি বলে?
ক. কর্মযোগ
খ. ভক্তিযোগ
গ. জ্ঞানযোগ
ঘ. সাংখ্যযোগ।

২। কি লাভ করলে হৃদয় পবিত্র হয়?
ক. জ্ঞান
খ. বৈরাগ্য
গ. ভক্তি
ঘ. খ্যাতি।

৩। যোগ অবলম্বন করে যে ঈশ্বর-আরাধনা তাকে কি বলে?
ক. ধর্মসাধনা
খ. যোগসাধনা
গ. ভক্তিসাধনা
ঘ. সংযম সাধনা।

৪। অষ্টাঙ্গ সাধনার উচ্চতম অবস্থানকে কি বলে?
ক. ধ্যান
খ. ধারণ
গ. পত্যাহার
ঘ. সমাধি।

আ) রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ধর্মের সাধারণ লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করুন।
[পাঠ– ১ এর খ ও গ অংশ থেকে লিখুন]

২। জীবের মাঝে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিখুন।
[পাঠ– ২ এর ব্রহ্ম ও আত্মা থেকে লিখুন]

৩। অবতারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।
[পাঠ– ৩ এর অবতার মাহাত্ম্য অংশ থেকে লিখুন]

৪। কর্মযোগের পরিচয় দিন।
[পাঠ– ৪ এর কর্ম অংশ থেকে লিখুন]

৫। জ্ঞানযোগের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
[পাঠ– ৪ এর জ্ঞান অংশ থেকে লিখুন]
৬। ভক্তিযোগের ফল বিশ্লেষণ করুন।
[পাঠ– ৫ এর ভক্তি অংশ থেকে লিখুন]
৭। অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ দিন।
[পাঠ– ৫ এর যোগসাধনা অংশ থেকে লিখুন]

ই) সংক্ষেপে উত্তর দিনঃ

ক. ধর্মদর্শন কি?
[ইউনিট– ৩ এর ভূমিকা থেকে লিখুন]
খ. ঈশ্বর শব্দটি কিভাবে গঠিত হয়েছে।
[পাঠ– ২ এর বিষয়বস্তু থেকে লিখুন]
গ. অবতার কাকে বলে?
[পাঠ– ৩ এর বিষয়বস্তু থেকে লিখুন]
ঘ. কর্মযোগের কয়টি ও কি কি?
[পাঠ– ৪ এর 'কর্ম' অংশ থেকে লিখুন]
ঙ. ভক্তি বলতে কি বুঝায়?
[পাঠ– ৫ এর 'ভক্তি' অংশ থেকে লিখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.১
১. ঘ; ২ . গ; ৩. খ; ৪. ঘ; ৫ ক; ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.২
১. গ; ২. ঘ; ৩. গ; ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৩
১. ক; ২. ঘ; ৩. ঘ; ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৪
১. খ; ২. ক; ৩. গ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৩.৫
১. খ; ২. গ; ৩. খ; ৪. ঘ